এইসময়
সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

একজন পুরুষকে শেখান, একজন পুরুষ শিক্ষিত হল। একজন নারীকে শেখান, একটি প্রজন্ম শিক্ষিত হল।

ব্রিগহ্যাম ইয়ং

ঋণের ঝুঁকি বনাম বৃদ্ধি

সুদের হার বাড়লে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় থাকবে?

ব্যক্তিগত ঋণ কিংবা ক্রেডিট কার্ডের মতো উপভোক্তা ঋণের দর অচিরেই ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই ধরনের ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দরুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অতএব তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ ধরনের ঋণের ঝুঁকিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বিভিন্ন ধরনের ঋণের ঝুঁকি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি সংখ্যা বা শতাংশ নির্ধারণ করে থাকে, যাকে বলা হয় 'রিস্ক ওয়েট'। যে ঋণের ঝুঁকি যত বেশি, তাদের 'রিস্ক ওয়েট'ও সমানুপাতে বাড়ে। এই 'রিস্ক ওয়েট' বৃদ্ধির অর্থ, আপৎকালীন প্রয়োজনের জন্য ব্যাঙ্ককে আরও বেশি পুঁজি জমা রাখতে হবে, পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'রিস্ক ক্যাপিটাল', যা তারা ঋণ হিসেবে দিতে পারবে না। ফলে ব্যাঙ্কগুলিও এর পরিণতিতে ব্যক্তিগত ঋণ বা ক্রেডিট কার্ড-এর উপর সুদের হার বাড়াতে পারে। এ ছাড়াও অ-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা, অর্থাৎ এনবিএফসি প্রদত্ত ঋণের 'রিস্ক ওয়েট'ও বাড়ানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলির একটি প্রেক্ষাপট আছে। গত দু'বছরে ভারতে খুচরো ঋণ বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ হারে, যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই ঋণবৃদ্ধির হার ১২-১৪ শতাংশ। আরও লক্ষণীয় যে এই ঋণদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে 'এনবিএফসি'গুলি। ২০১৮ সালে আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর আর্থিক সংকট সত্ত্বেও ২০১৫ থেকে ২০২২-এর মধ্যে আর্থিক বাজারে 'এনবিএফসি'গুলির অংশীদারিত্ব প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বিশেষত ডিজিটাল ঋণদান জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনবিএফসি-র রমরমা বেড়েছে। যারা অন্যত্র ঋণ পাচ্ছে না, তাদের ভরসা এনবিএফসি-গুলি, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে। সমস্যা হল, তাদের ঋণ ফেরত দেওয়ার ক্ষমতাও তুলনায় কম। ব্যাপক ঋণখেলাপের সম্ভাবনা ঠেকাতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এ হেন সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তের কী প্রভাব হতে পারে, সেটিও খতিয়ে দেখা দরকার। মনে রাখা প্রয়োজন, ভারতে এ মুহূর্তে গৃহস্থালির সঞ্চয়ের হার গত সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে নিম্নতম স্তরে। তা সত্ত্বেও দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে মূলত উপভোক্তাদের চাহিদার জন্য। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে উপভোক্তাদের এই চাহিদার প্রধান চালিকাশক্তি বিভিন্ন ধরনের ঋণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ফলে যদি সুদের হার বাড়ে এবং ঋণগ্রহণের প্রবণতা নিম্নগামী হয়, এবং তার দরুণ নিম্নগামিতা দেখা দেয় উপভোক্তাদের চাহিদার ক্ষেত্রে, সার্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবটিও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সাবধানতাই নির্বিকল্প

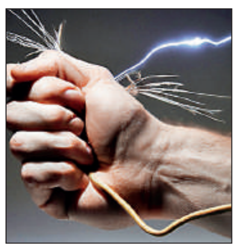

প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ছোটোখাটো প্রকাশ যেখানে দুর্বল, সেখানে তাদের মাথায় পা দিয়ে স্কাই-ডাইভিং, স্তিমিত জলোচ্ছ্বাসে সার্ফবোর্ডিং, এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিমান ওড়ানোয় অবিশ্বাস্য কেরামতি প্রদর্শন এখন জলভাত। নবীন প্রজন্ম এই সব দেখছে স্বাভাবিক অর্জন হিসেবে, যা কয়েক দশক আগেও অকল্পনীয় ছিল। অতএব তাদের স্বাভাবিকতার যা কিছু অঙ্গ, তা গত প্রজন্মের লোকেদের শিখতে হলেও, এই নতুন নাগরিকদের তা আশ্চর্যজনক ঠেকে না। অনেক শহরেই মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়তে দেখা এখন উড়োজাহাজের থেকে বেশি বিস্ময়কর। গোলমাল বাঁধে যখন নিয়ন্ত্রণরেখাটি অসাবধানতার ফলে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং ভয় পেয়ে থাকতে হবে না জানার পরে ভয়ের কারণগুলো ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। কানপুরে একই পরিবারের চারটি শিশু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেল বৈদ্যুতিক পাখা থেকে খোলা তারে হাত দেওয়ার ফলে। সামান্য পাখাকে মৃত্যুর দূত হিসেবে মস্তিষ্ক হয়তো এই পারমাণবিক বোমার যুগে ছেঁটেছে, সামান্য কোনও কারণ মৃত্যু বয়ে নিয়ে আসতে পারে, এমন সংশয় হয়তো হেলায় অবজ্ঞা করেছে। ছোটোখাটো সাবধানতা তবু জরুরি এই অকারণ মৃত্যুগুলির ভয়াবহ বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। সাবধানতা অবলম্বন করার বিকল্প এখনও নেই।

অসংখ্যা

১৪৮৪৬০

(এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশো ষাট) বর্গ কিলোমিটার—বাংলাদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্রফল। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দিনকেদিন

২২ নভেম্বর

১৯৬৩: আমেরিকার ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হয় টেক্সাসে। মৃত্যুকালীন তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর। আমেরিকার সব থেকে কনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট।

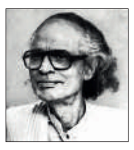

১৯৮৭: লোকসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রয়াত হন কলকাতায়। গণসঙ্গীতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আইপিটিএ বা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম পুরোধা ছিলেন।

তাপস ফজিল আয়াজ

গিরিশচন্দ্র সেন

বোধিবৃক্ষ

বণিকিদগের মধ্যে একজনের নগদ টাকা ছিল, সে সেই টাকা কোন স্থানে লুকাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রান্তরের ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পটমণ্ডপ নয়নগোচর হইল। সে উক্ত পটমণ্ডপের নিকটে যাইয়া দেখিল যে, একজন ফকির তস্বি হস্তে করিয়া নমাজের আসনে বসিয়া আছেন। বণিক্ তাহাকে পাইয়া ভাবিল, 'উত্তম হইল, মুদ্রা ইহার হস্তে অর্পণ করি।' সেই ফকিরই দস্যুদলপতি ফজিল। বণিক্ তাঁহার নিকটে যাইয়া আপনার অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার হস্তে টাকা রাখিতে চাহিল। ফজিল গৃহে প্রবেশ করিয়া মুদ্রা এক পার্শ্বে রাখিয়া দিতে বণিককে ইঙ্গিত করিলেন। বণিক্ তাহা করিল ও আপন সঙ্গীদিগের নিকটে চলিয়া আসিল। তখন তাহার সহচরগণ দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃতসর্বসস্ব হইয়াছিল। দস্যুগণ চলিয়া যাওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বীয় গচ্ছিত মুদ্রা আনয়ন করিবার জন্য পুনর্বার পটমণ্ডপের দিকে আসিল। তথায় দস্যুদিগকে দেখিল যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত বিভাগ করিতেছে। বণিক্ ইহা দেখিয়া, 'হায়! দস্যুর হস্তে টাকা সমর্পণ করিয়াছি' বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। ফজিল দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই ডাকিলেন। বণিক্ কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে গেল। ফজিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আসিয়াছ?' বণিক্ বলিল, 'গচ্ছিত ধন গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি।' ফজিল বলিলেন, 'যথায় রাখিয়াছ, সেখানেই আছে, লইয়া যাও।' তখন বণিক্ টাকা গ্রহণ করিয়া সহর্ষে সহযাত্রীদিগের নিকটে চলিয়া গেল। ('তাপসমালা: মোসলমান তপস্বীদের জীবনবৃত্তান্ত' থেকে গৃহীত)

দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থনীতিবিদরা স্বীকারই করেননি যে, নারীদের কর্মজগৎ আলাদা বিশ্লেষণের দাবিদার

মেয়েদের কাজও যে 'কাজ', শিখিয়েছেন যাঁরা

একজন সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অন্য জন সদ্যপ্রয়াত। ক্লডিয়া গোল্ডিন ও নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের গবেষণা ও উত্তরাধিকার। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

স্বাবলম্বী। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায়

মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের কাজকে 'কাজ' বলে চিহ্নিত করেনি দীর্ঘকাল, এমনকী অর্থনীতিবিদরাও। তথ্যের অভাবে মেয়েদের কাজের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। এই কাজে এই বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লডিয়া গোল্ডিন। অন্য দিকে, সদ্যপ্রয়াত অর্থনীতিবিদ নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রয়াণলেখ-তে স্রেফ 'নোবেলবিজয়ীর মা' অভিধা দিয়েছে। তা দুঃখজনক কারণ নির্মলা নিজের পরিচয়েই পরিচিত, মহারাষ্ট্রের নির্মলা পাটঙ্কর (বিবাহসূত্রে বন্দ্যোপাধ্যায়), লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে পাঠ শেষ করে কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সে-এ দীর্ঘকাল অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মেয়েদের কাজকে 'কাজ' বলে চিনতে শিখিয়েছেন আমাদের।

ক্লডিয়া গোল্ডিন অনেক কিছুতেই প্রথম। ২০২৩-এ অর্থনীতিতে প্রথম নারী যিনি নোবেল পেলেন একক ভাবে। এ ছাড়াও ক্লডিয়া হলেন প্রথম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো সময়ের স্থায়ী অধ্যাপিকা, সেই ১৯৯০ সালে। নোবেল কমিটি জানাচ্ছে অর্থনীতিতে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন কারণ 'তিনি কয়েক শতকে মেয়েদের শ্রমের বাজারে যোগদান আর আয়ের পার্থক্য নিয়ে এক সার্বিক বিবরণ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। নারীপুরুষের আয়ের এখনও কেন বৈষম্য চলে আসছে, তার কারণ আর সেই বৈষম্যে বদলের ধারা আর সেই সঙ্গে বৈষম্যের প্রধান কারণগুলি কী, তিনি জানিয়েছেন'।

আধুনিক প্রযুক্তি ও মেয়েরা

নির্মলা দেখিয়েছেন বাংলার মেয়েদের অর্থকরী কাজে যোগদানের হার সারা ভারতের তুলনায় বেশ কম। এখানকার মেয়েরা কি চিরকালই বেশি ঘরবন্দি থাকতেন, নাকি প্রযুক্তির অভিঘাতে কাজ চলে যাওয়ায় তাঁরা অর্থকরী কাজ থেকে সরে গিয়েছিলেন? এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে ১৯৮৯-এ নির্মলা লিখলেন 'ওয়ার্কিং উইমেন ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল: মডার্নাইজেশন অ্যান্ড মার্জিনালাইজেশন'। নির্মলা দেখালেন ১৮৮১-র আগে বাংলা ছিল ভারতে শিল্পে অগ্রসর অঞ্চলের অন্যতম। অবশিল্পায়নের ফলে ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলি ধ্বংস হতে শুরু করলেও উনিশ শতকের গোড়ায় শিল্পশ্রমিকের ২০% ছিল মেয়েরা। সারা ভারতে সেই অনুপাত ছিল ১৫%। ১৮৮১ সালে প্রতি তিন জনে একজন মেয়ে কৃষিকাজে যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে, যেখানে বিহার, ওডিশাও যুক্ত ছিল, তা নিলে ১৯১১ পর্যন্ত ৪১% মেয়ে নানা দ্রব্য নির্মাণ ও বিক্রয়ের কাজে যুক্ত থাকছেন, কিন্তু নতুন প্রযুক্তি আসায় সারা দেশের তুলনায় বাংলায় মেয়েদের কাজগুলিই বেশি করে চলে গেল। চিরাচরিত ক্ষেত্র থেকে মেয়েদের কাজ চলে গেছে যে পরিমাণে, আধুনিক ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সেই অনুপাতে কাজ সৃষ্টি হয়নি। একই সঙ্গে তিনি দেখালেন নেহরুর পরিকল্পনায় মেয়েদের জন্য চিরাচরিত ক্ষেত্রের বাইরে বিশেষ ভাবনা ছিল না।

শুধু ইতিহাস থেকে জনগণনার তথ্য ছেনে বা পরিকল্পনার ভাবনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা নয়, আধুনিকতম বিষয়গুলিতেও নির্মলা আমাদের পরিচিত করিয়েছিলেন, 'জেন্ডার বাজেট' তার অন্যতম। টাকা শুধু সমান বরাদ্দ করলেই হয় না, সে টাকায় নারী-পুরুষ সমান সুযোগ পাচ্ছে কি না, তা-ও দেখতে হবে। যেমন স্কুলশিক্ষায় ১০০ টাকা বরাদ্দ করে দেখতে হবে ছাত্রী আর ছাত্র সমান অনুপাতে ভর্তি হচ্ছে কি না। শৌচালয়ের অভাবে প্রাথমিকের পর মেয়েরা যদি স্কুলে কম আসে তা হলে মেয়েদের জন্য সমানুপাতিক হারে নয়, বেশি হারে খরচ বরাদ্দ করতে হবে যাতে তারা স্কুলে আসতে পারে। এটাই হবে বাজেটে জেন্ডার-সাম্য রক্ষা। সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নেত্রী এলা ভাটের মৃত্যুর পর তাঁর প্রয়াণলেখতে নির্মলা বলছেন, পাঁচ-ছয়ের দশকের উন্নয়নের মডেল আধুনিক শিল্পের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, যেখানে নিয়মিত বেতনের পাকা চাকরি, নিয়োগকর্তা আর নিযুক্তের মধ্যে চুক্তি। কিন্তু এর বাইরে যে বিরাট সংখ্যায় অসংগঠিত আর স্বনিযুক্ত কর্মী, তাঁদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধার ভাবনা ছিলই না। সেখানেই এলা ভাটের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, যা রূপ পেয়েছে অসংগঠিত মেয়েদের উপর প্রামাণ্য দলিল 'শ্রমশক্তি'তে, এলার নেতৃত্বে নির্মলাও ছিলেন যার অংশীদার। আবার দেবকী জৈনের সঙ্গে সহ-সম্পাদনায় 'টিরানি অফ দ্য হাউজহোল্ড'-এর প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ মেয়েদের কাজের সংজ্ঞা, সেখানে সম্প্রসারণ-সংশোধন নিয়ে ভাবছে। তাত্ত্বিক স্তরের সঙ্গে মাটিতে পা রেখে চলার জন্যই আটের দশকে নারী সংগঠন 'সচেতনা' তৈরিতেও সমান উদ্যোগী ছিলেন নির্মলা। মেয়েদের কাজ আর বৈষম্য নিয়ে সহজ করে লিখলেন 'পরিবার, কাজ ও বৈষম্য' (২০০৭)। এই পরিক্রমা তাঁর সমস্ত লেখার আলোচনা নয়, আমাদের কোথায় কতটা সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তার মাইলফলকগুলি একত্র করা।

◀ **তথ্য ও সত্য।** ২০২৩-এ অর্থনীতিতে নোবেল-জয়ী ক্লডিয়া গোল্ডিন

পরিসংখ্যান-সত্যান্বেষণ

ক্লডিয়া আমেরিকায় মেয়েদের দু'শো বছরের কাজে যোগদানের ইতিহাসকে খুঁজে বের করেছেন। তখন যেটুকু তথ্য থাকত, সেই তথ্য নারীপুরুষে বিভাজিত হত না। যেমন ধরা যাক ১৮২০-তে কোওন রাজ্যে ক্ষেতে খামারে ১০ হাজার মানুষ কাজ করেছেন শুধু এই তথ্য পাওয়া গেল। সেই শ্রমজীবীর কতজন নারী আর কতজন পুরুষ, তার হিসেব নেই। তাই নোবেল কমিটি তাঁকে বলেছেন 'পরিসংখ্যান-সত্যান্বেষী' বা 'ডেটা স্লেউথ'। সেই তথ্য খুঁড়ে এবং খুঁজে বার করে তিনি দেখালেন আমেরিকার ইতিহাসে গত দু'শো বছরে মেয়েরা প্রথমে ১৭৯০ নাগাদ কৃষিকাজে যোগ দিয়েছেন, তখন তাঁরা প্রায় ৬০%, তার পর শিল্প আসার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মেয়েদের কাজে যোগদানের হার কমতে কমতে প্রায় ১৫% হয়ে গেছে, কারণ পরিবারের কাজের কোনও বিকল্প নেই, নিজেদেরই সব কাজ করতে হবে। এর পর ১৯১০-এর পর থেকে আবার আমেরিকান মেয়েরা বাইরের অর্থকরী কাজে যোগ দিচ্ছেন, কারণ পরিষেবা ক্ষেত্র চালু হয়েছে, তার আয়তন বাড়ছে। পাঁচের দশকের পর গর্ভনিরোধক বড়ি মেয়েদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনছে। মেয়েরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে কখন ক'টি সন্তান চান, স্থির করতে পারছেন। ক্লডিয়ার গবেষণা বলছে, মেয়েদের কাজে যোগদানে শিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তো বটেই, সেই সঙ্গে আগের প্রজন্ম বা মায়েরা কতটা শিক্ষিত তার উপরে তার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। অর্থনীতির তত্ত্ব যখন বলে অর্থকরী কাজে যোগদানের হার শুধু উন্নয়নের সঙ্গে, প্রত্যাশার সঙ্গে, গ্রাম থেকে শহরে পরিযানের সঙ্গে যুক্ত, তখন তা শুধু পুরুষের যোগদানের কারণকে ধরতে পারে। মেয়েদের কাজে যোগদানের হার ধরতে গেলে বিয়ের বয়স, বিয়ের পরে কাজ করবে না কি গুছিয়ে সংসার করবে, সংসারের কাজগুলির বাজারি বা সামাজিক বিকল্প তৈরি হয়েছে কিনা, এ সবের উপরে নির্ভর করবে। ১৯৯০-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করল তাঁর এই প্রধান গবেষণা: 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য জেন্ডার গ্যাপ: অ্যান ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ আমেরিকান উইমেন'।

২০২১-এ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা থেকে বেরোয় তাঁর আর এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ: 'কেরিয়ার অ্যান্ড ফ্যামিলি: উইমেন্স সেঞ্চুরি লং জার্নি টুয়ার্ডস ইকুইটি'। পরিবার আর পেশাদারি জীবন, দুয়ের মধ্যে মেয়েদের জীবন এগোয়। তিনি কিন্তু 'ইকুয়ালিটি' বা সমতা শব্দটা ব্যবহার করেননি, লিখেছেন 'ইকুইটি', মানে সমান প্রাপ্তির দিকে। ক্লডিয়া গোল্ডিন-এর গবেষণার আগে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কাজে যোগদান বাড়ার সরলরৈখিক নীতি বলে প্রচলিত তত্ত্বও দেখল আসলে মেয়েদের কাজ প্রথমে বাড়ছে, তার পর কমছে, তার পর আবার বাড়ছে। আর মেয়েদের অর্থকরী কাজে যোগদান বাড়লেও মজুরির ফারাক খুব ধীরে কমছে। এখনও প্রথম সন্তান জন্মের পর মেয়েদের মজুরির হারে একটা ছেদ আসে, কারণ অনেকেই সাময়িক ভাবে সন্তানপালনে মন দেয়, পরে সন্তান একটু বড় হলে কাজে ফেরে, কিন্তু ওই ছেদের ফলে একই পেশায় তাঁদের মজুরি যায় কমে। ক্লডিয়া দেখেছেন বিশ শতকে আধুনিকতা, আর্থিক বিকাশ, বেশি সংখ্যক মেয়ে অর্থকরী কাজে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও নারীপুরুষের প্রাপ্তির ফারাক খুব ধীরে কমছে। ক্লডিয়া বলেছিলেন, অর্থনীতিতে মেয়েদের স্বচ্ছন্দ করে নেওয়ার মতো কোনও ধারণা দেওয়া হয় না বলেই এত কম মেয়ে অর্থনীতিতে আগ্রহী। যেন অর্থনীতি মানে শুধু টাকাকড়ি আর ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু অর্থনীতি যে অসাম্য, স্বাস্থ্য, পরিবারের মধ্যে নারীপুরুষের আচরণ, সমাজ, এ সবকে নিয়েই— এটা যদি বলা হত, তা হলে হয়তো মেয়েরা অনেক বেশি সংখ্যায় আগ্রহী হতো, অর্থনীতি পাঠের পরিসরে নারীপুরুষ সংখ্যায় কাছাকাছি আসত।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

প্রতি সম্পাদক

সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা কেন?

'এ মায়া প্রপঞ্চময়' শীর্ষক সম্পাদকীয়র (১২-১১) প্রেক্ষিতে এই চিঠি। প্রযুক্তি যেমন মানুষের বহু উপকারে লাগছে, সেই রকম প্রযুক্তির কারণেই মানুষ বহু সমস্যায় পড়ছে। 'ডিপফেক' এমন এক প্রযুক্তি, যায় কারিকুরিতে আসল আর নকলের ব্যবধান ঘুচে গেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ডিপফেক, তারকা ও রাজনীতিবিদদের কাছে ক্রমশই এক অভিশাপ হয়ে উঠেছে। কেননা এই প্রযুক্তির সাহায্যে সেলিব্রিটিদের ভুয়ো পর্ন বা আপত্তিকর ভিডিও তৈরি করা যায়। এই প্রযুক্তির নকলনবিশির ক্ষমতা এতটাই যে, বিভিন্ন ভাবে যাচাইয়ের পরও কোনও খুঁত ধরা পড়ে না। ডিপফেক হল আসলে ভুয়ো ছবি, ভিডিয়ো বা অডিও। সেখানে কারও মুখের আদল কিংবা কণ্ঠস্বর বদলে ফেলা যায় অনায়াসে। আর এই সব কাজ করা সম্ভব হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-এর সাহায্যে। বর্তমানে এআই-এর দৌলতে এই সব কাজ করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হয় অনেককেই। মজার ছলে বলতে গেলে, কেউ চাইলে তার নিজস্ব সুরে প্রিয় বা অপ্রিয় তারকাকে গাওয়াতে বা নাচাতে পারে। শুধু ভিডিও নয়, ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যাপক ভাবে অডিও ম্যানিপুলেটও করতে পারে।

অবশ্যই ডিপফেক প্রযুক্তির বেশ কিছু ভালো দিকও আছে। বিশেষ করে বিনোদন শিল্পে এই প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন ডাবিংয়ের মান উন্নত করতে, মৃত অভিনেতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে কিংবা জাদুঘর বা গ্যালারিকে প্রাণবন্ত করতে এই প্রযুক্তির জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিপফেক যবে থেকে জনপরিসরে এসেছে, তখন থেকেই তার নেতিবাচক ব্যবহারই বেশি।

রাজনৈতিক ভাবে ভুল তথ্য দেওয়া, সেলিব্রিটিদের নিয়ে কুৎসিত ভিডিয়ো এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণার কাজে এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বর্তমান যুগ হল সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। একটি খবর সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে যত দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, অন্য কোনও মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। গুজব ও বিভ্রান্তি দ্রুত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার, আর এখানেই ডিপফেক টেকনোলজির জয়জয়কার। তাই ডিপফেকের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইলে, অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য যত কম শেয়ার করা যায় ততই মঙ্গল। বিশেষত যে সব ভিডিয়োর মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো সম্ভব, সেই ধরনের ভিডিয়ো অনলাইনে শেয়ার না করাই ভালো। ব্যক্তিগত ডেটা নিয়ে কেউ যদি উদ্বিগ্ন থাকে, তা হলে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট ব্যক্তিগত করে রাখাই ভালো।

রবীন রায়, শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

পুলিশ এবং লজ্জাবোধ

আরণ্যক এক্সপ্রেসে মেদিনীপুর থেকে সাঁতরাগাছি যাচ্ছি। বসে আছি সংরক্ষিত আসনে। ট্রেন যত না এগোয়, থামে বেশি। এ লাইনে এই যন্ত্রণা বেশ কয়েক মাস চলছে। পাঁশকুড়া স্টেশনে এই ট্রেন দাঁড়াল। আমার পাশের আসনের ভদ্রলোক টয়লেটে গেলেন। সেই আসন ফাঁকা পেয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন রেলপুলিশ, যিনি পাঁশকুড়ায় উঠেছেন তিনি বসে পড়লেন। তাঁর কাঁধের ফিতেয় দেখি একটি তারকা রয়েছে। তার মানে অফিসার। বললাম, এখানে এক ভদ্রলোক আছেন, টয়লেটে গেছেন। পুলিশ অফিসার উত্তর না দিয়ে আয়েশ করে বসলেন। যাঁর আসন তিনি ফিরে এসে পুলিশ অফিসারকে বললেন, আমার সিট এটা। অফিসারটি তাকালেন যাত্রীটির দিকে। যাত্রীটি কথা না বাড়িয়ে পাশের সিটে বসলেন। এমন সময়ে মুড়িওয়ালার হাঁক। অফিসার মুড়িওয়ালাকে ইশারায় মুড়ি দিতে বললেন। মুড়িওয়ালা মুড়ি মেখে দিলেন, পয়সা চাইলেন না এবং অফিসারও দিলেন না। এমন সময়ে চা ওয়ালার প্রবেশ আমাদের কামরায়। দেখি একই ইশারায় চা নিলেন। চা-ওয়ালা পয়সার কথা উচ্চারণ করলেন না। পুলিশ 'ভদ্রলোক' নিঃসংকোচ, নির্বিকার। পরে ওই চা-ওয়ালার কাছে পয়সা না নেওয়ার কারণ জানতে চেয়ে ছিলাম। ছেলেটি বলল, দিনে এ রকম কয়েক কাপ এদের খাওয়াতে হয়। টাকা চাইলেই উল্টোপাল্টা কবে ফাঁসিয়ে দেবে তার ঠিক আছে? জলে বাস করে কুমিরকে কি কেউ রাগায়? ভাবলাম, ক্ষমতা মানুষের স্বভাবকে কত নীচে নামায়! স্বভাব এদের ভিখারি করে রেখেছে বোধ হয়।

সুদর্শন নন্দী, রাঙামাটি, মেদিনীপুর

স্টেশনে অসুস্থ! মৃত্যুই নিয়তি?

শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাওয়া আসা। মেডিক্যাল সহায়তার কোনও ব্যবস্থা আছে কি? গত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ ডায়মন্ড হারবারের প্রবীর হালদারের স্টেশন চত্বরে কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়। এক সহৃদয় যাত্রী তাঁর চোখেমুখে জল দেন, জল খাওয়ান এবং নিত্য যাত্রীদের কাছে আবেদন করেন তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সাহায্য করতে। কেউই সে ডাকে সাড়া দেয় না। ওই ব্যক্তি জিআরপি-র কাছে যান। সেখানেও তেমন সাড়া পাননি, শুধু একটা ট্রলি দেওয়া হয়েছিল। সেই ট্রলিতে প্রবীরকে চাপিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে নিকটবর্তী নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যান ওই ব্যক্তি। ইতিমধ্যে ৩৫/৪০ মিনিট কেটে গেছে। হাসপাতালে ঢোকার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে ওই ব্যক্তি জানান। প্রশ্ন হল, এই ধরনের ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কি মারা যাবে মানুষ? রেল কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম দায় থাকবে না? অবিলম্বে শিয়ালদহ স্টেশনে ২৪ ঘণ্টার কার্যকরী মেডিক্যাল সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছি।

আলতাফ আমেদ, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

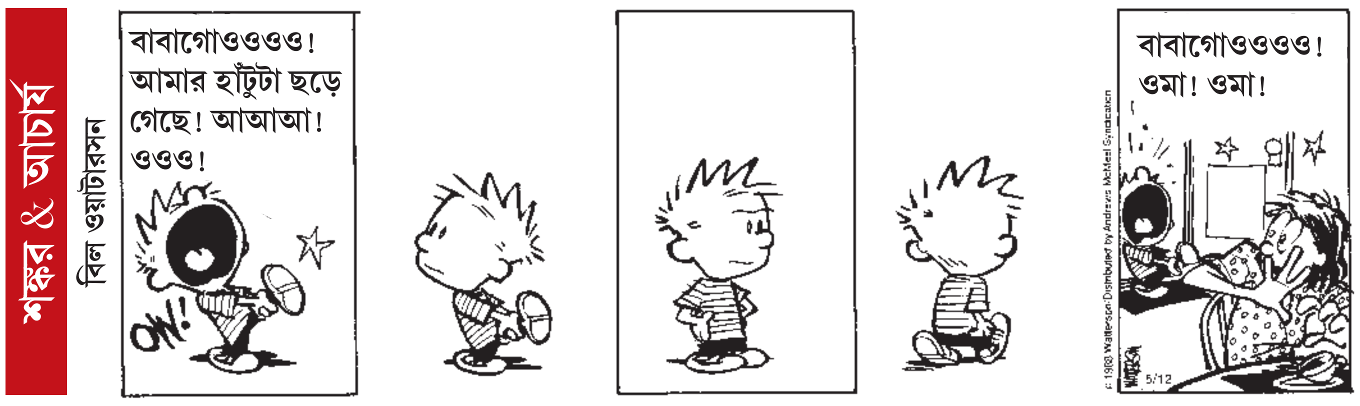
শঙ্কর & আচার্য
বিল ওয়াটারসন
বাবাগোওওওও! আমার হাঁটুটা ছড়ে গেছে! আআআ! ওওও!
OW!
বাবাগোওওওও! ওমা! ওমা!
© 1988 Watterson Distributed by Andrews McMeel Syndication
5/12

প্রসঙ্গত

প্রশ্ন। এবং উত্তর

সেন্সর বোর্ড আটকে দিল 'জয় বাংলা'

বাংলাদেশে বিকল্প চলচ্চিত্রের ধারা কী ভাবে বিস্তার লাভ করল?

মোরশেদুল ইসলাম

চলচ্চিত্র পরিচালক

প্রেক্ষাপটটা একটু বলি। বাংলাদেশে ছবির যে ট্রেন্ড ছিল, সেখানে বেশির ভাগটাই ছিল ভারতীয় ছবির নকল। সেগুলির মধ্যে কোনও সমাজ-সচেতনতামূলক বক্তব্য ছিল না বা শিল্প মানের কোনও ব্যাপার ছিল না। তার মধ্যে যে গোটা দুয়েক শিল্পমানসম্পন্ন ছবি হচ্ছিল, সেই ছবিগুলি সিনেমা হলে দেওয়া যাচ্ছিল না। কারণ সিনেমা হল মালিকরা আগ্রহী ছিল না! যদি বা রিলিজ দিল, তবে মাত্র কিছুদিনের জন্য। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যবস্থা। তখন আমরা যারা ফিল্ম সোসাইটি করি তারা ভাবলাম আমরা ভালো ছবি তৈরি করব। এই সাহসটি করেছিলাম একটা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের জন্য। কোর্স পরিচালক ছিলেন আলমগীর কবীর। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমরা বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহস অর্জন করি। তখন আমি আমার প্রথম ছবি 'আগামী' শুরু করলাম। একই সঙ্গে আমাদের আর একজন সহকর্মী তনভির মোকাম্মেলও কাজ শুরু করলেন। শিল্পী এসএম সুলতানের জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি তথ্যচিত্র দিয়ে শুরু করেন তারেক মাসুদ। তবে শুধু ছবি করার জন্য ছবি করব, তা নয়। আমাদের কিছু বলারও ছিল। ১৯৭১ সালে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হল একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাধীনতার অর্জনগুলিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা হল। আবারও কিছুটা পাকিস্তানি ভাবধারায় দেশ চলতে শুরু করলো। তখন দীর্ঘ কয়েক বছর স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা যেত না! আমার ছবিতে এই বিষয়টি তুলে ধরব বলে মনস্থির করলাম। তাই-ই করলাম। আমার ছবিতে একটি ছোট্ট ছেলের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত করলাম। এই ছবিটি ২০১৩ সালে শাহবাগ মোড়ে রাজাকার-বিরোধী আন্দোলন মঞ্চে দেখানো হতে থাকলো। ছবিটি প্রথম রিলিজের সময়ে সেন্সর বোর্ড আটকে দিল। কারণ ছবিতে বাচ্চা ছেলেরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়েছে। বোর্ড বলল এটা বলা যাবে না! অথচ 'জয় বাংলা' আমাদের একাত্তরের শ্লোগান ছিল। এক জায়গায় ছিল 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী', এটাও বলা যাবে না। বলতে হবে কেবল 'হানাদার বাহিনী'। এর পরে আমরা সেন্সর বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললাম। দেশব্যাপী আন্দোলন হল, ফলে ছবি সেন্সরে পাশ হল। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য ছবিটি ১৯৮৫ সালে ভারতের দিল্লিতে দশম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্যপদক পায়। এই ছবির সূত্র ধরে তানভীর মোকাম্মেলের 'হুলিয়া' রিলিজ হল এবং তার পরে অনেক ছেলে ছবি বানাতে শুরু করল। এখন বাংলাদেশের সিনেমা অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের হাত ধরে।

সাক্ষাৎকার: **গোপী দে সরকার**